আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

১. মুখবন্ধ

অসংখ্যক ধর্ম এবং নৈতিক নিয়ম-পদ্ধতির উপস্থিতি (বর্তমান) সভ্যতার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। মানব জাতি সবযুগেই সৃষ্টির কার্যকারণ এবং বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টির পরিকল্পনায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল।

স্যার আর্নল্ড টয়েনবি বিভিন্ন যুগের মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক গবেষনা করে ১০ খণ্ডে বিভক্ত এক স্মরণীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁর গবেষনার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, মানব ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকাই মূখ্য। The observer ২৪ শে অক্টোবর ১৯৫৪ পত্রিকায় তিনি লিখেন–

"আমি এ বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করেছি যে, মানব অস্থিত্বে রহস্যময় ভূমিকা পালন করে ধর্ম।"

অক্সফোর্ড ডিকশনারী মতে 'ধর্ম' হচ্ছে "অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিতে বিশ্বাস, বিশেষত ব্যক্তিগত দেব-দেবীতে বিশ্বাস, যাকে পূজা-উপাসনা করা ও আনুগত্য করা বলা যায়।"

প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি সার্বজনীন 'খোদায়' বিশ্বাস করা অথবা একটি অতি প্রাকৃতিক সর্বোচ্চ, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তৃপক্ষে বিশ্বাস। প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীরাও মনে করে যে, তারা যে খোদার পূজা করে অন্যেরাও সে একই খোদার উপাসনা করে। মার্ক্সবাদ, ফ্রয়েডিয় মতবাদ এবং অন্যান্য ধর্মহীন মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ সংগঠিত ধর্ম-সমূহের মূলোৎ পাটনে আক্রমণ চালিয়েছেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। উদাহরণহিসেবে বলা যায় যে, কমিউনিজম যখন অনেক দেশেই বিস্তৃতি পায় তখন তারাও ধর্মকে একই অভিধায় চিহ্নিত করে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে।

যাই হোক, ধর্ম মূলত মানবীয় অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন, তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি, যেন কোন কিছুকেই তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি। এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে; যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বলো তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা অবশ্যই মুসলিম (আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মসমর্পিত)। (সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪)

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়নে আমার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, এ অধ্যয়ন আমার বিশ্বাসে দৃঢ়তা এনেছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানবাত্মাকে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এমন যে, সে স্রষ্টার অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নেয়, নচেৎ সে স্রষ্টার বিপরীত সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। অন্য কথায় আল্লাহতে বিশ্বাস কোন শর্ত সাপেক্ষ নয়, আল্লাহ-বিশ্বাস বাতিল করণ-ই শর্তসাপেক্ষ।

২. বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর শ্রেণীবিন্যাস

বিশ্বের ধর্মসমূহকে প্রথমত দু'টো শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়– সেমিটিক ও ননসেমিটিক। এ ননসেমিটিক ধর্মগুলোকে আবার দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা: আর্য এবং অনার্য ।

সেমিটিক ধর্মসমূহ

সেমিটিক ধর্মগুলো এমন ধর্ম যেগুলোর উদ্ভব ঘটেছে মূলতঃ সেমিটিয় তথা হিব্রু, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বাইবেলের বর্ণনামতে নূহ (আ)-এর এক পুত্র নাম ছিল 'শাম'। শাম-এর বংশধরগণ 'সেমিটিয়' নামে পরিচিত। সুতরাং সেমিটিক ধর্মগুলোর উৎপত্তি হয়েছে ইহুদী, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয়দের মধ্যে। প্রধান প্রধান সেমিটিক ধর্মবা মতবাদগুলো হলো– ইহুদী মতবাদ, খ্রিস্টীয় মতবাদ এবং ইসলাম। এ ধর্মগুলো পয়গাম্বরীয় ধর্ম যা আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক আনীত স্বর্গীয় নির্দেশনায় বিশ্বাসী।

ননসেমিটিক ধর্মসমূহ

একে আবার এরিয়াল বা আর্য, নন্ এরিয়াল বা অনার্য এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

আর্য ধর্মসমূহ

আর্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি আর্য জাতির মধ্যেই, যারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাষি একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী। এরা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত ইরান এবং উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

আর্যধর্মগুলো আবার বৈদিক ও অবৈদিক এ দু'ভাগে বিভক্ত। বৈদিক ধর্ম হিন্দুবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ নামে অভিহিত। আর অবৈদিক ধর্মগুলো হলো শিখবাদ, বুদ্ধবাদ, জৈনবাদ ইত্যাদি। সবকটি আর্য ধর্মই অপয়গাম্বরীয় ধর্ম অর্থাৎ কোন নবী-রাসূল কর্তৃক এসব ধর্ম প্রবর্তিত হয়নি।

জওরাষ্ট্রীয় ধর্মও একটি আর্য ও অবৈদিক ধর্ম যা হিন্দুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ধর্মের দাবী হলো যে, এটা পয়গাম্বরীয় ধর্ম।

অনার্য ধর্মসমূহ

অনার্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকারে হয়েছে। 'কনফুসীয়' ও 'তাও' বাদের উৎপত্তি হয়েছে চীনে। কিন্তু শিন্টো ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে জাপানে। এসব অনার্য ধর্ম সমূহে 'আল্লাহ' সম্পর্কে কোন ধারণার অস্তিত্ব নেই . এসব ধর্মকে মূলত কিছু কিছু নৈতিক নিয়মাবলীর সমাহার বলাই শ্রেয়।

কোন ধর্মে আল্লাহ'র যথার্থ সংজ্ঞা ঃ কোন ধর্মের অনুসারীদের 'আল্লাহ' সম্পর্কিত ধারণা তাদের ব্যবহারিক জীবনকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিচার করা যায় না। এটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার যে, অনেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে 'আল্লাহ' সম্পর্কে কী বর্ণনা আছে তা জানে না। অতএব যে কোন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে 'আল্লাহ' সম্পর্কে কী ধারণা দেয়া আছে সেটাই বিশ্লেষণ করা উত্তম।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে 'আল্লাহ' সম্পর্কিত যে ধারণা দেয়া সেটাই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

৩. হিন্দু ধর্মে 'আল্লাহ' সম্পর্কে ধারণা

আর্য ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম। 'হিন্দু' শব্দটি একটি ফারসি শব্দ। সিন্দু উপত্যকার আশে-পাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। সে যাই হোক হিন্দু ধর্ম বহুত্ববাদে বিশ্বাস সম্বলিত একটি সাধারণ ধর্ম। যার অধিকাংশ 'বেদ, 'উপনিষদ', এবং 'ভগবতগীতা' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভরশীল।

হিন্দু ধর্মে 'আল্লাহ' সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ঃ হিন্দু ধর্ম বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্ম। বস্তুত অধিকাংশ হিন্দুই এ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কতেক হিন্দু তিন ইশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কিছু হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতাও বিশ্বাসী অর্থাৎ ৩ শত ৩০ মিলিয়ন দেবতা। তবে শিক্ষিত হিন্দুরা যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখে তারা বলে যে, একজন হিন্দুর উচিত এক ইশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এক ইশ্বরের উপাসনা করা।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ইশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধিসম্পর্কিত। সাধারণভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদ তথা সর্বভূতে ইশ্বর অর্থাৎ সবকিছুতে ইশ্বর আছেন-এ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সর্বেশ্বরবাদের মূলকথা হলো জৈব অজৈব সব কিছুই ঐশ্বরিক এবং পবিত্র। তাই হিন্দুরা গাছ, সূর্য, চন্দ্র, জীবজন্তু এমনকি মানব প্রজাতির মধ্যেও ইশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করে এবং সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক বস্তুই ইশ্বর।

অপরদিকে ইসলাম মানুষকে শেখায় যে, মানুষ নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিক সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টির নমুনা মাত্র। এসব কিছু আল্লাহ নয়। অন্য কথায় আমরা বিশ্বাস করি সবকিছুর মালিক আল্লাহ। গাছপালা, সূর্য চন্দ্র এবং এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো apostrophe 's' অর্থাৎ হিন্দুরা বলে, সবকিছুই ইশ্বর' আর মুসলিমরা বলে, 'সবকিছুই আল্লাহ'র'।

পবিত্র কুরআন বলে– تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ـ

"এসো তোমাদের ও আমাদের মধ্যেকার একটি সাধারণ বিষয়ে। প্রথম সাধারণ বিষয় হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪)

অতএব আসুন আমরা হিন্দু ও মুসলিমের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে তা থেকে উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যগুলো বের করার চেষ্টা করি।

ভগবত গীতা ঃ হিন্দুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ হলো 'ভগবতগীতা'। গীতার নিম্নোক্ত শ্লোক দেখুন–

"ঐ সব লোক যাদের বুদ্ধি মেধা বস্তুতান্ত্রিক, ইচ্ছা কর্তৃক আচ্ছন্ন, তারা সাকার ইশ্বরের অনুগত এবং তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে পূজার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে।" (ভগবত গীতা অধ্যায় ৭, শ্লোক ২০)

গীতা সিদ্ধান্ত দেয় যে, যারা বস্তুবাদী তারা সাকার ইশ্বরের পূজা করে অর্থাৎ সত্যিকার নিরাকার ইশ্বরের পাশাপাশি সাকার ইশ্বরের পূজা করে।

উপনিষদ ঃ হিন্দুরা উপনিষদকেও পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে। উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো দেখুনঃ

১. "একম ইভাদ্বিতীয়ম" অর্থাৎ 'তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া'। (Chandgya উপনিষদ ৬ ঃ ২ ঃ ১)

২. "তার কোন মাতাপিতা নেই, কোন প্রভুও নেই।"

(Svetasa vatara উপনিষদ) দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২৬৩)

৩. উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোও লক্ষ্য করুনঃ "তাঁর মত কিছুই নেই।"

(Svetasa vatara উপনিষদ অধ্যায় ৪ ঃ ১৯)

"তাঁর মত কিছু নেই যার নাম মহিমময় উজ্জ্বল।"

(The Principal উপনিষদ কৃত এস. রাধাকৃষ্ণ পৃ. ৭৩৬ ও ৭৩৭)

(পাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলী ভলিউম ১৫, উপনিষদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)

উপরোক্ত শ্লোকগুলোর সাথে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তুলনা করুনঃ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

"তাঁর সদৃশ কিছু নেই কেউ নেই।" (সূরা ইখলাসঃ ৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

"কোন কিছুই এমন নেই যা তাঁর মত হতে পারে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্ট।" (সূরা শূরাঃ ১১)

৪. উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো আল্লাহর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ধারণ করতে মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেঃ

"তাঁর রূপ দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখে দেখেনি; যারা হৃদয় ও আত্মা দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করে, তাঁর উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে, তারাই অমরত্ব লাভ করে।" (Svetas vatara উপলনিষদ, ৪ ঃ ২০)

পবিত্র কুরআন উপরোক্ত ধারণাকে নিম্নোক্ত আয়াতে প্রকাশ করেঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সুবিজ্ঞ।" (সূরা আন্'আমঃ ১০৩)

হিন্দুদের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'বেদ' সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। তাদের প্রধান 'বেদ' ৪টি– ঋগবেদ, আয়ুর্বেদ, শ্যামবেদ ও অথর্ববেদ।

১. আয়ুর্বেদঃ (ক) আয়ুর্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুনঃ

"তার কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই।" (আয়ুর্বেদ ৩২ঃ ৩)

এতে আরও উল্লিখিত হয়েছে– "যেহেতু তিনি কিছু থেকে, কারো থেকে জন্ম নেননি, তাই তিনি আমাদের উপসনার উপযুক্ত।"

"তাঁর কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, তাঁর মহিমা অত্যন্ত মহান। তিনি তাঁর মধ্যে সকল উজ্জ্বল বস্তু ধারণ করেন, যেমন সূর্য। তিনি যেন আমার অকল্যাণ না ঘটান– এটাই আমার প্রার্থনা। যেহেতু তিনি কিছু থেকে বা কারো থেকে জন্ম নেননি। তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।"

(আয়ুর্বেদঃ দেবীচাঁদ এম. এ. পৃ. ৩৭৭)

(খ) "তিনি নিরাকার এবং পবিত্র।" (আয়ুর্বেদ ৪০ঃ ৮)

"তিনি আলোময়, নিরাকার, নিস্পৃশ্য, পবিত্র, যাকে শয়তান বিদ্ধ করতে পারে না; তিনি অদৃশ্য, প্রাজ্ঞ, পরিবেষ্টনকারী; তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি যখন যা ইচ্ছে তা-ই করেন, তিনি চিরঞ্জীব।'

(আয়ুর্বেদ ৪০ঃ ৮) (আয়ুর্বেদ সংহিতাঃ আই. এইচ গ্রীফিথ পৃ. ৫৩৮)

(গ) আয়ুর্বেদে আরও উল্লিখিত আছে– "তারাই অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে; যেমন বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি। তারা গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়– যারা 'শম্ভূতি'র উপাসনা করে। 'শম্ভূতি' হলো সৃষ্ট বস্তু যেমন টেবিল, চেয়ার, প্রতিমা ইত্যাদি। (আয়ুর্বেদ ৪০ঃ৯)

(ঘ) আয়ুর্বেদে এ প্রার্থনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছেঃ "আমাদের ভালো পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের পাপরাশি মুছে ফেলুন যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে" (আয়ুর্বেদ ৪০ ঃ ১৬)

২. অর্থব বেদঃ অথর্ববেদের এ শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুনঃ "দেব মহা অসি" অর্থাৎ ইশ্বর অত্যন্ত মহান। (অর্থববেদ ৩০ ঃ৫৮ঃ ৩)

"যথার্থই তুমি আলোময়, তোমার প্রকাশ মহানঃ তুমিই সত্য, অদ্বিতীয়, তোমার প্রকাশ মহান, যেহেতু তোমার প্রকাশ মহান, তাই তোমার মহানত্ব সর্ব স্বীকৃত, সত্যই মহান তোমার প্রকাশ, হে ইশ্বর!"

(অথর্ববেদ সংহিতা ভলিউম ২ উইলিয়াম সাইট হুইটনি পৃ. ৯১০)

কুরআন মাজীদের সূরা রা'দ-এ একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ .

"তিনিই একমাত্র মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান" (সূরা রা'দ ঃ ৯)

৩. ঋগবেদঃ (ক) সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো ঋগবেদ। হিন্দুরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ঋগবেদে বর্ণিত আছে যে, "জ্ঞানী ঋষিগণ এক ইশ্বরকে বহু নামে ডাকে।" (ঋগবেদ ১ঃ ১৬৪ঃ ৪৬)

(খ) ঋগবেদে সর্বশক্তিমান ইশ্বরের কমপক্ষে ৩৩ টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর বেশিরভাগ উল্লিখিত হয়েছে ঋগবেদ ২য় পুস্তকে, ১ম শ্লোকে।

ঋগবেদে উল্লিখিত সর্বশক্তিমান ইশ্বরের গুনবাচক নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো 'ব্রহ্মা' অর্থা 'স্রষ্টা'। এ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'খালিক'।

'ব্রহ্মা' Creator বা 'স্রষ্টা হলে এবং এর দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বুঝালে মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মুসলমানরা কখনও এমত সমর্থন করে না যে, 'ব্রহ্মা'-ই স্রষ্টা বা খালিক যার মাথা ৪টি। (আমরা এ বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।) মুসলমানরা এর চরম ব্যতিক্রম মত পোষণ করে।

সর্বশক্তিমান ইশ্বরকে 'নরবিজ্ঞান' শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রকাশ করা স্বয়ং আয়ুর্বেদের নিম্নোক্ত বক্তব্যেরও পরিপন্থি

"ন তস্যৎ প্রতিমা অস্তি" অর্থাৎ তার কোন সদৃশ বা প্রতিমা নেই। (আয়ুর্বেদ ৩২ঃ ৩)

ঋগবেদ দ্বিতীয় পুস্তক, প্রথম চরণ, শ্লোক ৩ (আর বি ২ঃ ১ঃ ৩)-এ উল্লিখিত হয়েছে 'বিষ্ণু' অর্থাৎ 'প্রতিপালক' যার আরবী প্রতিশব্দ 'রব' এতেও মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই যে, সর্বশক্তিমান ইশ্বরকে 'রব' 'সাসটেইনার' বা 'বিষ্ণু' নামে ডাকা হবে। কিন্তু হিন্দুদের সার্বজনীন ধারণা বিষ্ণুর হাত চারটি। তিনি ডান দিকের এক হাতে 'চক্র' (ভারী চাকা), আর বাম দিকের এক হাতে 'কঞ্চ (শামুক) ধারণ করে আছেন। তিনি একটি পাখির উপর অথবা সর্পাসনে উপবিষ্ট। মুসলমানরা কখনো ইশ্বরের এমন ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে না। উপরোল্লিখিত বিশ্বাসও আয়ুর্বেদের অধ্যায় ৪০ শ্লোক ১৯-এর সাথে সংঘর্ষিক।

(গ) ঋগবেদের নিম্নোক্ত শ্লোক লক্ষ্যণীয়। "বন্ধুগণ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ইশ্বর।" (ঋগবেদ ৮ ঃ ১ঃ ১)

[ঋগবেদ সংহিতি val-9) পৃ.১৩২ স্বামী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালংকার]

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মন্তত্র

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মন্তত্র হলো–"একরকম ব্রহ্মা, দ্বিতীয়া ন্যস্ত নেহন ন্যস্ত কিঞ্চন।"

অর্থাৎ "ইশ্বর এক-দ্বিতীয় নেই। মোটেই নেই মোটেই নেই, একেবারেই নেই।"

যা হোক হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত বিষয়ের মাধ্যমে আমরা হিন্দুধর্মে ইশ্বরের ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম।

৪. শিখ ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

শিখ ধর্ম একটি অসেমটিক; আর্য ও অবৈদিক ধর্ম। এটা যদিও প্রধান ধর্মসমূহের তালিকাভূক্ত নয়; কিন্তু এটা হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়। এটা সংগঠিত হয়েছে পাকিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে, যা পঞ্চ নদের অববাহিকা। গুরু নানক একটি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্রে) হিন্দু পরিবার জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা গভীরভাবেপ্রভাবিত হন।

'শিখ, এবং 'শিখবাদের' সংজ্ঞা ঃ 'শিখ' শব্দটি 'শিষ্য' শব্দটি থেকে এসেছে। শিষ্য অর্থ ভক্ত বা অনুসারী। 'শিখ' ধর্ম দশজন গুরুর ধর্ম। প্রথম গুরু হলেন গুরু নানক এবং ১০ম ও শেষ গুরু হলেন গুরু তেগাবিন্দ শিং। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ শ্রী গুরুগ্রন্থ যাকে আদি গ্রন্থ সাহেবও বলা হয়ে থাকে।

পাঁচ 'ক'

প্রত্যেক 'শিখ'-কে পাঁচ 'ক' ধারণ করতে হয়, যা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি বহন করে।

১. 'কেশ'- অকর্তিত বেশ বা চুল, যা সকল গুরুই রাখে।

২. 'কঙ্গ'- চিরুনী যা চুলকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবহৃত হয়।

৩. 'কাদা'-লোহা বা অন্য ধাতুর তৈরি বালা বা কঙ্কন, যা শক্তি-ক্ষমতা বা আত্মসংযমের প্রতীক।

৪. 'কৃপাণ'– ত্রিফলা খঞ্জর যা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।

৫. 'কাচ্ছা'- জানু পর্যন্ত লম্বা অন্তর্বাস বিশেষ যা কর্মতৎপরতার পক্ষে সুবিধাজনক।

মূলমন্ত্রঃ শিখ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসঃ ইশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে শিখরা তাদের পবিত্র গ্রন্থের প্রথমেই 'মূলমন্ত্র' উদ্ধৃত করে থাকে- এটা তাদের মৌলিক বিশ্বাস, যা গুরু গ্রন্থ সাহেব-এর শুরুতে উল্লিখিত আছে।

গুরুগ্রন্থ সাহেব-ভলিউম-১, জাফ্জী-এর প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে-

"ইশ্বর মাত্র একজন যাকে বলা হয় সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে উর্ধ্বে। তিনি অমর, তিনি জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান এবং করুণাময়।"

শিখধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে। এ ধর্ম এক সার্বভৌম বিমূর্ত ইশ্বরে বিশ্বাস করে, যাকে 'এক ওমকারা' বলে।

'ওমকারা' পরিচয় প্রকাশে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লিখিত হয়েছে–

'করতার'- স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা,

'সাহিব'-বা প্রভু,

'অকাল'-আদি-অন্তহীন,

'সত্যনামা'-পবিত্র নাম',

'পরওয়ারদিগার'- প্রতিপালক,

'রহীম' - দয়াময়,

'করীম' - সদাশয়,

তাঁকে 'ওয়াহি গুরু' অর্থাৎ একক সত্য ইশ্বরও বলা হয়। শিখ ধর্ম কঠোরভাবে একত্ববাদ হলেও তা 'অবতারবাদ'-এ বিশ্বাস করে না। 'অবতারবাদ' হলো ঈশ্বরের মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন সংক্রান্ত মতবাদ। তাদের মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনো 'অবতার রূপে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেন না। তারা মূর্তি পূজারও ঘোর বিরোধী।

গুরু নানক কবীর কর্তৃক প্রভাবিত ঃ

গুরু নানক 'কবীর'নামে এক মুসলিম সাধক-এর শিক্ষায় প্রভাবিত হন। 'শ্রী গুরু নানক সাহেব'-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে সাধক কবীর রচিত চরণগুলো উল্লিখিত আছে। কয়েকটি চরণ নিম্নে উল্লিখিত হলো–

"দুঃখে মেঁ সুমিরানা সব করেঁ সুখ মেঁ করেঁ

না কয়া জু সুখ মেঁ সুমিরানা করেঁ তু দুখ কায়ে হুয়ে"।

অর্থাৎ "বিপদে পড়লে সবাই স্রষ্টাকে স্মরণ করে, কিন্তু শান্তি ও সুখের সময় কেউ তাঁর স্মরণ করে না। যে শান্তি ও সুখের সময় তাঁকে স্মরণ করবে তার কেন বিপদ হবে?"

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আলকুরআন এর নিম্নোক্ত আয়াত উপরোক্ত চরণের সাথে তুলনা করুন–

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً ـــ مِنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ

"আর যখন মানুষের উপর কোন দুঃখ-কষ্ট আসে তখন সে তার প্রতিপালককে একনিষ্ঠভাবে তার অভিমুখী হয়ে ডাকতে থাকে; অতপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে ভুলে যায় সে কথা, যার জন্য পূর্বে তাকে ডাকছিল এবং আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, যাতে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে।" (আল কুরআন-৩৯ ঃ ৮)

৫. জরোষ্ট্রীয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

জরোষ্ট্রীয় ধর্ম প্রাচীন আর্য ধর্ম গুলোর একটি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যে এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এ ধর্মমতের অনুসারীর সংখ্যা কম হলেও সারা বিশ্বে এর অনুসারির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের কম নয়। এটা প্রাচীন ধর্মগুলোর একটি। ইরানী নবী জরোস্টারকে এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধারা হয়। এ ধর্ম পারসী ধর্ম হিসেবেও পরিচিত। এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো 'দসতীর' ও প্রভু, আর 'মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ' । আর তাই 'আহুরা মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ প্রভু'। 'আহুরা প্রভু, আর 'মাজদা' অর্থ 'অর্থ 'প্রাজ্ঞ। আর 'মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ'। আর তাই 'আহুরা মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ প্রভু'। 'আহুরা মাজদা' দ্বারা এক অদ্বিতীয় প্রভুকে বুঝানো হয়ে থাকে।

দসতীর অনুসারে ইশ্বরের বৈশিষ্ট্য

দসতীর অনুসারে 'আহুরা মাজদার' নিম্নোক্ত গুণাবলী রয়েছে-

(১) তিনি একক (২) কিছুই তাঁর সদৃশ নয় (৩) তিনি আদি অন্তহীন (৪) তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই (৫) তাঁর কোন আকার-আকৃতি নেই (৬) দৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না এবং কল্পনা শক্তিও তাঁকে আয়ত্ব করতে অক্ষম। (৭) তিনি মানবীয় ধারণা-কল্পনার বহু উর্ধ্বে। (৮) তিনি মানুষের নিজের চেয়েও নিকটতর।

'আবেস্তা' অনুসারে ইশ্বরের বৈশিষ্ট্য

'আবেস্তা'-তে 'গাথা' ও 'ইয়াসনা' আহুরা মাজদা'র যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে তা হলো-

(১) সৃষ্টিকর্তা ঃ (ইয়াসনা ৩১ঃ ৭ ও ১১) ইয়াসনা ৪৪ঃ৭) (ইয়াসনা ৫০ঃ ১১দ (ইয়াসনা ৫১ঃ ৭)

(২) সর্বশক্তিমান-শ্রেষ্ঠঃ (ইয়সনা ৩৩ ঃ ১১), (ইয়াসনা ৪৫ ঃ ৬)

(৩) করুণাময়- "হুদাই" ঃ (ইয়াসনা ৩৩ঃ ১১) (ইয়াসনা ৪৮ঃ ৩)

(৪) দানশীল- 'স্পেন্তা'

(ইয়াসনা ৪৩ঃ ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) (ইয়াসনা ৪৪ ঃ ২) (ইয়াসনা ৪৫ঃ ৫) ইয়াসনা ৪৬ ঃ ৯) (ইয়াসসনা ৪৮ঃ ৩)

৬. ইয়াহুদী ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ইয়াহুদী ধর্ম প্রধান সেমিটিক ধর্মসমূহের অন্যতম। এর অনুসারীদেরকে ইয়াহুদী নামে অভিহিত করা হয়। নিজেদেরকে তারা মূসা (আ) প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবী করে।

(১) নিম্নোক্ত শ্লোকটি বাইবেল 'পুরাতন নিয়ম'- এর 'ডিওটারেনমী' অধ্যায়ে উদ্ধৃত মূসা (আ)-এর উপদেশনামা থেকে গৃহীত।

"শামা ইজরাঈলিউ আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইশাদ।"

এটা একটা হিব্রু ভাষার বাইবেল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত শ্লোক এর অর্থ– "ইসরাঈলীরা শোন আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক। (বাইবেল, ডিওটারেনমী ৬ঃ ৪)

(২) বাইবেলের "ঈসাইয়্যাহ" অধ্যায়ে উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ্য করুন–

"আমি, আমিই একমাত্র প্রভু এবং আমি ছাড়া অন্য কোন ত্রাণকর্তা নেঈ।" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৩ঃ১১)

(৩) "আমি-ই প্রভু, এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৫ঃ ৫)

(৪) "আমি-ই ঈশ্বর এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই; আমি-ই ইশ্বর এবং আমার সদৃশ কেউ নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৬ঃ ৯)

(৫) ইয়াহূদী ধর্মে প্রতিমা পূজাকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে নিন্দা করা হয়েছে–

"আমার পাশাপাশি তুমি অন্য কাউকে ইশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি নিজের জন্য কোন প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা উর্ধ্বাকাশে অথবা পৃথিবীতে আছে অথবা ভূগর্ভে জলে আছে এমনকোন কিছুর সদৃশ স্থির করবে না; তুমি তাদের সামনে বিনীত হবে না, আর না তাদের উপাসনা করবে; কেননা আমি-ই একমাত্র প্রভু, তোমার ইশ্বর, ঈর্ষাপরায়ণ ইশ্বর....।" (বাইবেল, এক্সোডাস ২০ঃ ৩-৫)

(৬) বাইবেলের ডিওটারোনমীতে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে–

"আমার পাশাপাশি অন্য কাউকে ইশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি কোন কিছুর প্রতিমা তৈরি করবে না: অথবা উর্ধ্বাকাশে, পৃথিবীতে অথবা ভূগর্ভে জলে যা কিছু আছে তার কোন কিছুর সদৃশ তৈরি করবে না: এসবের সামনে তুমি কখনোনত হবে না, আর তাদের প্রার্থনাও করবে না; কেননা, আমি একমাত্র প্রভু, তোমার ইশ্বর ইর্ষাপরায়ণ ইশ্বর...।" (বাইবেল, ডিওটারোনমী ৫ঃ ৭-৯)

৭. খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

খ্রিষ্টধর্মও একটি সেমিটিক ধর্ম। খ্রিস্টানদের দাবী মতে সারা বিশ্বে দুই শত একটি অনুসারী রয়েছে। যীশু খ্রিস্ট তথা ঈসা (আ)-এর নামানুসারে খ্রিস্টধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ঈসা (আ) ইসলাম ধর্মেও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্ট ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ইসলামে ঈসা (আ)-এর মর্যাদা কতটুকুতা দেখা যাক।

(১) অখ্রিস্টান ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম যাতে ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস পোষণ করা হয়। ঈসা (আ)-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে কোন মুসলিম-ই পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে না।

(২) মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার একজন মর্যাদাশীল নবী ছিলেন।

(৩) তারা করে যে, তিনি কোন পুরুষের সংস্রব ছাড়া অলৌকিকভাবে পিতৃবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন, যা আধুনিকালের অনেক খ্রিস্টান মানতে চান না।

(৪) তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবন দান করতে পারতেন।

(৫) মুসলমানরা আরো বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধকে দৃষ্টিসমান্ন করতে এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করতে সক্ষম ছিলেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয়ধর্মই যদি ঈসা (আ)-কে ভালবাসে ও সম্মান করে, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে বিশ্বাসে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈসা (আ)-কে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা ও উপাস্যের যোগ্য মনে করে, যা ইসলাম কখনো স্বীকার করে না। খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঈসা (আ) কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেননি। মূলত বাইবেলের নতুন নিয়মে ও এ জাতীয় দাবী সম্বলিত একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি বলেছেন "আমি ঈশ্বর" অথবা "আমাকে উপাসনা করো।" বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যাক বাইবেলে উদ্ধৃত তার বাক্যগুলোতে কী আছে– "My Father is Greater than I."

"আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।" (যোহন ১৪ঃ ২৮)

"My Father is Greater than all."

"আমার পিতা সকলের চেয়ে মহান।" (যোহন ১০ঃ ২৯)

"..I cast out devils by the spirit of God..."

"আমি সকল মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে...।" (মথি ১২ঃ ২৮)

"With the finger of God cast out devils..."

"..ঈশ্বরের সাহায্যেই আমি মন্দ দূর করি।" (লূক ১১ঃ ২০)

"আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না; আমি যেমন শুনি তেমন-ই বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক; কেননা আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে চাই না, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার ইচ্ছা অনুসারেই আমি কাজ করতে চাই।"

যীশু খ্রিষ্টের মিশন- তিনি এসেছিলেন আইনকে পূর্ণ করতে

যীশু কখনো নিজের ঐশ্বরিকতার দাবী করেননি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে 'ইশ্বর' বা 'ইশ্বরের পুত্র' বলে দাবী করেন নি। তিনি তাঁর মিশনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছেন। পূর্বে প্রেরীত কিতাব তাওরাতকে পূর্ণতা দানের জন্য ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন, যা ইয়াহুদীদের হাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মথি লিখিত সুসমাচারের) নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়–

"তোমরা ভেবনা যে, আমি আইন তথা মূসা (আ)-এর তাওরাতের বিধান অথবা নবীদের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা করতে আসিনি, বরং সেসব পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি– আকাশ ও পৃথিবী যতদিন চলতে থাকবে ততদিন সেই বিধানের কোন একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও মুছে যাবে না। যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হয়।"

"অতপর যে কেউ এ সকল বিধানের সামান্য বিধানও অমান্য করবে এবং মানুষকে তা অমান্য করতে শেখায়,

তাকে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে ছোট মনে করা হবে। অপরদিকে যে কেউ বিধানসমূহ পালন করবে এবং অন্যকে তা পালন করতে শেখাবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান মনে করা হবে।" (বাইবেল মথি ৫ঃ ১৭-২০

যিশু ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষঃ বাইবেল নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে যিশুর মিশনের ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে–

"...and the word which ye hear is not mine, but the Father's which has sent me."

অর্থাৎ, "...এবং তোমরা যা আমার কাছ থেকে শোন, তা-তো আমার কথা নয়, বরং সেসব কথা পিতার যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" (বাইবেল যোহন ১৪ ঃ ২৪)

"And this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus Chirst, whom thou has sent."

অর্থাৎ, "এবং এটাই শাশ্বত জীবন যে, তারা তোমাকে তথা সত্য ঈশ্বরকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রিস্টকে জানবে।" (বাইবেল যোহন ১৭ ঃ ৩)

যিশু তার উপর দেবত্ব আরোপের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লিখিত নিম্নোক্ত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন–

"And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?"

And he said unto himn-

"Why callest thou me good? There is none good but one, that is God; but if thou will enters into life, keeps the commandments."

অর্থাৎ "এবং, দেখো, একজন লোক এলো এবং যিশুকে বললো– হে ভাল প্রভু! আমাকে এমন ভাল কাজ সম্পর্কে বলুন, যা করলে আমি অনন্ত জীবন।"

যিশু তাকে বললেন–

"আমাকে ভাল বলছো কেন, এক ছাড়া কেউ ভাল নেই, আর তিনি হলেন 'ঈশ্বর'; তুমি যদি অনন্ত জীবন পেতে চাও, তবে তাঁর সব আদেশ পালন করো।"

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা যিশুর 'ঈশ্বর' হওয়া সংক্রান্ত খ্রিস্টানদের মতবাদ এবং যিশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের মতবাদ বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছে।

যিশু মানবজাতির চূড়ান্ত মুক্তি লাভের জন্য স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার উপর জোর দিয়েছেন। (বাইবেল মথি ৫ঃ ১৭-২০)

নাজারাথবাসী যিশু– ঈশ্বরের মনোনীত এক মানুষ

বাইবেলের নিম্নোক্ত বিবরণ ইসলামী এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে, যিশু আল্লাহর নবী ছিলেন–

"Ye men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, man approaved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know."

অর্থাৎ "হে ইসরাইলীরা এ কথাগুলো শোনোঃ নাজারাথবাসী যিশু ইশ্বরের মনোনীত একজন মানুষ যিনি ইশ্বরের অলৌকিক, আশ্চর্যজনক নিদর্শন।" ইশ্বর তার দ্বারা যা করেছেন তা তোমাদের মধ্য থেকেই করেছেন যা তোমরা নিজেরাই জান।"

সর্বপ্রথম নির্দেশ-ইশ্বর এক অদ্বিতীয়

বাইবেলে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ কখনো সমর্থন করে না। একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোনটি? এর উত্তরে তিনি তা-ই পুনরুক্তি করলেন যা মূসা (আ) বলেছিলেন–

"শামা ইসরাইলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইখাত."

এটা একটা হিব্রু উদ্ধৃতি যার অর্থ হলো–

"হে ইসরাঈলীরা শোন! আমাদের প্রভু ইশ্বর একক প্রভু।" (মার্ক ১২ঃ ২৯)

৮. ইসলামে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ইসলাম একটি সেমিটিক ধর্ম। সারা বিশ্বে ইসলামের একশত বিশ কোটি অনুসারী রয়েছে। 'ইসলাম' অর্থ আল্লাহর ইচ্ছাতে আত্মসর্পণ। মুসলমান কুরআন-কে আল্লাহর বাণী হিসেবে মানে, যা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলাম বলে যে, আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে একত্ববাদের দাওয়াত এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জবাবদিহীতার বার্তামানুষের দ্বারে পৌছানোর জন্য তাঁর দূত এবং নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম অতীতকালের সকল নবী-রাসূল তথা আদম (আ) থেকে শুরুকরে যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাদের সকলের উপর বিশ্বাস করাকে তার বিশ্বাসের মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকূব (আ), মূসা (আ), দাউদ (আ), ইয়াহইয়া (আ) ও ঈসা (আ) এবং অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)।

ঈশ্বরের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইশ্বর তথা আল্লাহর সবেচেয় সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী পরিচয় দেয়া হয়েছে কুরআন মাজীদের ১১২ নং সূরা ইখলাসের চারটি আয়াতের মাধ্যমে-

(১) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - বলুন, তিনি আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)

(২) اَللّٰهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ অমুখাপেক্ষি

(৩) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - তিনি কাউকে জন্মদেননি, কারো থেকে তিনি জন্মনেননি।

(৪) لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ- আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাসঃ ১-৪)

এ সূরায় উল্লিখিত 'আস-সামাদ' আরবী শব্দটির যথার্থ অনুবাদ একটু দু:বাধ্য। তবে এর মূল অর্থের কাছাকাছি অর্থ হলো Absolute existence অর্থাৎ পরম অস্তিত্ব। এটা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্থায়ী ও শর্তসাপেক্ষ। এ শব্দ দ্বারা এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভশীলনন বরং সকল ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর উপরই নির্ভরশীল এবং সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী।

সূরা ইখলাস-ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথরঃ সূরা ইখলাসকে (সূরা-১১২) কুরআন মাজীদের কষ্টিপাথর বলা যায়। গ্রীক ভাষার 'থিও' অর্থ ইশ্বর আর 'লজি' অর্থ জ্ঞানআর্জন। 'থিওলজি' অর্থ ইশ্বর তথা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানআর্জন সংক্রান্ত বিদ্যা। সূরা ইখলাসের এ চারটি লাইন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানের কষ্টিপাথর হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক উপাস্যের দাবীদারকে অবশ্যই এ সূরার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে হবে। পরম উপাশ্য আল্লাহর যে পরিচয় এ সূরায় দেয়া হয়েছে, তার আলোকে মিথ্যা দেব-দেবী এবং ঐশ্বরিকতার দাবীদারের মিথ্যা দাবী অত্যন্ত সহজেই নাকচ হয়ে যায়।

মানুষের ইশ্বর হওয়ার দাবী সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য

ভারত হলো মানব-ইশ্বরের দেশ। এটা এজন্য বলা হয় যে, এখানে তথাকথিত আধ্যাত্মিক গুরুর সংখ্যা অগণিত। এ সমস্ত 'বাবা' এবং 'গুরু'র অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করাকে ইসলাম নিন্দা করে।

মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান বুঝার জন্য এরূপ এক মানব-ইশ্বর 'ভগবান রজনীশ' সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। রজনীশ ভারতের আধ্যাত্মিক গুরুদের অন্যতম। ১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা গমন করেন এবং সেখানে 'রজনীশপুরম' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি পাশ্চাত্যের রোষানলে পড়েন ও গ্রেফতার হন। অবশেষে তিনি আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং তার জন্মভূমি 'পুনা'-তে 'ওশো' নামে আরেকটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওশো রজনীশের অনুসারীরা মনে করেন যে, তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান ইশ্বরের মানবরূপ তথা অবতার। একজন পর্যটক 'ওশো' জনপদে ভ্রমণ করলে দেখতে পাবে যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর সমাধিফলকে পাথরে খোদাই করে লিখে রেখেছে যে,

"ওশো কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। কখনো মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি শুধুমাত্র পৃথিবী গ্রহটি পরিদর্শন করে গেছেন- ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।"

তারা সম্ভবত এটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছে যে, তাঁকে পৃথিবীর ২১টি বিভিন্ন দেশের ভিসা দেয়া হয়নি। রজনীশের অনুসারীরা এটাকে কোন সমস্যা হিসেবে মনে করেনি যে, 'পৃথিবী ভ্রমণকারী অবতার' বলে বিশ্বাস করে তাকে কোন দেশে প্রবেশ করার জন্য সে দেশের অনুমতি তথা ভিসার প্রয়োজন হয়।

চলুন, ভগবান রজনীশের 'অবতার' হওয়ার দাবীকে সূরা ইখলাসের কষ্টিপাথরে ফেলে পরীক্ষা করা যাক।

(১) প্রথম মানদণ্ড হলো- "বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়"। রজনীশ কী এক ও অদ্বিতীয়? এর উত্তর, 'না'। রজনীশের মতো অনেকেই ইশ্বরের অবতার হওয়ার দাবী করেছে। রজনীশের কতেক শিষ্য এখনও এ দাবীর উপর অটল রয়েছে যে, রজনীশ এক ও অদ্বিতীয়।

(২) দ্বিতীয় মানদণ্ড হলো- "আল্লাহ পরম অস্তিত্বশীল ও মুখাপেক্ষীহীন। নিশ্চয়ই রজনীশ পরম অস্তিত্বশীল ছিলেন না, কেননা তিনি ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। রজনীশের জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও পুরাতন শিরদাঁড়ার রোগে ভুগছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, আমেরিকান সরকার তাঁকে কারাগারে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভেবে দেখুন

সর্বশক্তিমান ভগবানকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে! সুতরাং রজনীশ যেমন চিরঞ্জীব ছিলেন না, তেমনি তিনি মুখাপেক্ষীহীনও ছিলেন না।

(৩) তৃতীয় মানদণ্ড হলো– আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। আমরা জানি যে, রজনীশ ভারতের জবলপুরে এক পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে তাঁরা উভয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি 'রজনীশপুরম' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি পাশ্চাত্যের রোষানলে পড়েন । অবশেষে গ্রেফতার হয়ে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয় ভারতে ফিরে আসেন এবং পুনাতে তাঁর অনুসারীদের জন্য 'ওশো' নামে একটি শহর গড়ে তোলেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনুসারীরা তাকে 'সর্বশক্তিমান ভগবান' বলে বিশ্বাস করে। কোন ভ্রমণকারী 'ওশো' জনপদে গেলে সেখানে রজনীশের সমাধিতে পাথরে খোদাই করে এ কথাগুলো লেখা দেখতে পাবে– "ওশো- তিনি কখনো জন্মগ্রহণ করেননি এবং কখনো মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি 'পৃথিবী' নামক গ্রহটি শুধুমাত্র পরিদর্শনে এসেছিলেন ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত।"

তারাকি এটা ভুলে গেছে যে, রজনীশ বিশ্বের ২১টি দেশে প্রবেশের জন্য ভিসা দেয়া হয়নি। কেউ কী এটা ভেবে দেখেছে যে, 'ভগবান'-কে পৃথিবী পরিদর্শনে এসে কোন দেশে প্রবেশের জন্য ভিসা চাইতে হবে! গ্রীসের আর্চ বিশপ বলেছেন যে, রজনীশ যদি সে দেশ থেকে বের হয়ে না যায় তাহলে তারা তার শিষ্য-সাগরেদ সহ তার বাসস্থান জ্বালিয়ে দেবে।

(৪) চতুর্থ মানদণ্ড যা অত্যন্ত কঠোর তা হলো– "আল্লাহর সদৃশ সমকক্ষ কেউ নেই, কিছু নেই।" ইশ্বরত্বে দাবীদার কাউকে কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা সম্ভব হলে, তার ইশ্বরত্ব তাৎক্ষণিক বাতিলবলে প্রমাণিত হবে।সত্যিকার একক আল্লাহর কোন কাল্পনিক আকার-আকৃতি কল্পনা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আমরা জানি যে, রজনীশ একজন মানুষই কিছু ছাড়া আর নয়। যার ছিল শুভ্র লম্বা দাড়ি। তার ছিল দু'টো চোখ, দু'টো কান, একটা নাক, একটি মুখ। রজনীশের ছবি সম্বলিত পোষ্টার প্রচুর পাওয়া যায়। এত করে এটা সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে 'ইশ্বর' বা ভগবান হতে পারে না।

একইভাবে যে ব্যক্তিটি শারীরিক শক্তিমত্তা হেতু 'মিস্টার ইউনিভার্স' উপাধিপ্রাপ্ত তাকেও কেউ 'ইশ্বর' হিসেবে কল্পনা করতে পারে বটে, কিন্তু সূরা ইখলাসে বর্ণিত ৪টি মানদণ্ডের আলোকে একমাত্র একক অদ্বিতীয় 'আল্লাহ' ছাড়া কেউ ঈশ্বর হতে পারে না।

আমরা যে নামে ইশ্বরকে ডাকিঃ মুসলমানরা ইংরেজী শব্দ 'গড' এর পরিবর্তে একক সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে। 'গড'-এর চেয়ে আরবী শব্দ 'আল্লাহ,-ই সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও যথার্থ। 'গড' শব্দের সাথে 'এস' ইংরেজী বর্ণ যুক্ত করে তাকে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা যায়; কিন্তু 'আল্লাহ' এক সত্তা। আল্লাহ শব্দের কোন বহুবচন হয় না। আবার 'গড'-এর সাথে 'des' যোগ করলে তা স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। 'আল্লাহ' শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না। 'গড' শব্দের আগে Tin শব্দাংশ যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'মিথ্যা উপাস্য'। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শব্দ যা সম্পর্কে কল্পনা করে কোন আকার বা আকৃতি ধারণা করা যায় না। এসব কারণে মুসলমান এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে। তবে যেহেতু এই বইয়ের পাঠক বা

সম্বোধিত মানুষ সাধারণভাবে মুসলমান ও অমুসলমান উভয় প্রকার রয়েছে, তাই আমি এতে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'গড' শব্দটি-ই অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছি।

'গড' কখনো মানুষ হতে পারে নাঃ কিছু লোক যুক্তি পেশ করে যে, ইশ্বর যদি সবকিছু করতে সক্ষম, তবে তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারবেন না কেন? তিনি ইচ্ছা করলে তিনি মানব-আকৃতি ধারণ করতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলে 'ইশ্বর' আর ইশ্বর থাকেন না। কেননা 'ইশ্বর' আর মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী। একই সত্তার মধ্যে ইশ্বরত্ব ও মানবত্বের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হতে পারে না। 'অবতারবাদ' বা ইশ্বরের মানবাকৃতি ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ কোন কোন ধর্মে থাকলেও তা যে অবান্তর এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

'ইশ্বর' অবিনশ্বর অথচ মানুষ নশ্বর। মানব-ইশ্বর তথা এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে অবিনশ্বর ঐশ্বরিক সত্তা নশ্বর মানবদেহ ধারণ করবে। এ জাতীয় ধারণা অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

ইশ্বর-এর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অনাদি ও অনন্ত। অপরদিকে মানুষের শুরু যেমন আছে তেমনি শেষও আছে। এমন কোন সত্তা মানুষের মধ্যে নেই যার মধ্যে শুরু না থাকা এবং শুরু থাকা উভয়ই বিদ্যমান আছে। মানুষের শেষ আছে কারণ মানুষ মরণশীল। এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে অবিনশ্বরতা ও নশ্বরতা উভয় গুণের সমাবেশ পাওয়া যাবে। সর্বশক্তিমান ইশ্বরের পানাহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষকে তার জীবনকে কর্মচঞ্চল রাখার জন্য পানাহার করতে হয়। অতএব স্রষ্টা বা ইশ্বর বা আল্লাহর মানবরূপ ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ মাত্র।

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ـ

"And He it is that Feeds but is not fed."

অর্থাৎ তিনি খাদ্য দান করেন, কিন্তু তিনি খাদ্যগ্রহণ করেন না।" (সূরা আনআমঃ ১৪)

আল্লাহর কখনো বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রয়োজন নেই; অথচ মানুষ বিশ্রাম ও নিদ্রা ছাড়া চলতে পারে না।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط

"Allah, there is no 'Ilah' but He- The living, The Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens an the earth."

অর্থাৎ "আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৫)

মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের উপাসনা নিষ্ফল ঃ যেহেতু 'ইশ্বরে'র মানবরূপ ধারণ তথা অবতারবাদ গ্রহণীয় নয়, তাই আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে একমত হবো যে, কোন মানুষের উপাসনা করা নিষ্ফল কেবল মাত্র। ইশ্বর যদি মানব-আকৃতি ধারণ করে, তা হলে তিনি অবশ্যই ঐশ্বরিক গুণাবলী ত্যাগ করেই মানবরূপ ধারণ করবেন এবং তিনি ঐ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হবেন। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, একজন মেধাবী অধ্যাপক যদি দুর্ঘটনায় পড়ে

তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে এমতাবস্থায় তার ছাত্রদের পক্ষে তাঁর নিকট তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষা গ্রহণের কাজ চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না অবশ্যই।

অতপর বলা যায় যে, ইশ্বর যদি মানবরূপ ধারণ করেন, তখন আর কখনো তার পূর্বরূপ ইশ্বরত্বে ফিরে যেতে পারবে না, কেননা মানুষ ইচ্ছামতে অনুযায়ী ইশ্বরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মানব-ইশ্বর এর উপাসনা করা অযৌক্তিক এবং সর্বপ্রকার অবতারবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

আর এজন্যই কুরআন মাজীদে সর্বপ্রকার মানব-ইশ্বর বা অবতারবাদের অর্থাৎ ইশ্বরের প্রতিরূপ নির্ধারণের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ـ

অর্থাৎ "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।" (সূরা শুরাঃ ১১)

"There is nothing whatever like create him."

'ইশ্বর' কখনো অন্যায় ও তাঁর পক্ষে অশোভন কাজ করতে পারেন না

সর্বশক্তিমান 'ইশ্বর' যিনি ন্যায়বিচার, করুণা, সত্য ও অনন্ত-অনিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তিনি কখনো এমন কাজ করতে পারেন না, যা সৃষ্টিসুলভ তাঁর সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের পারিপন্থী। তদ্রূপ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়ার কথাও কল্পনা করা যায় না। তবে 'ঈশ্বর' যদি ইচ্ছা করেন তাহলে অন্যায় করতে পারেন; কিন্তু তিনি কখনো তা করেন না, করবেনও না, যেহেতু এটা অন্যায়, আর এমন অন্যায় কাজ স্রষ্টার জন্য অশোভন।

কুরআন মাজীদ বলে إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

"Allah is never unjust in the least degree."

অর্থাৎ "আল্লাহ কখনো এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না।" (সূরা নিসাঃ ৪০)

ঈশ্বর যদি চান অত্যাচারী হতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর যখনই অত্যাচারী হবেন সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর ঐশ্বরিকতা হারাবেন।

ঈশ্বর ভুলে যেতে পারেন না, আর না তিনি ভুল করতে পারেন

ঈশ্বর কখনো ভুলে যেতে পারেন না, কেননা ভুলে যাওয়া ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটা মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতারমাত্র। একইরূপে ঈশ্বর ভুল করতে পারেন না, কেননা ভুল করা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয়।

কুরআন বলে– لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ـ

"...my lord never errs, nor forgets."

অর্থাৎ, ...আমার প্রভু বিভ্রান্তও হননা, ভুলেও যান না।" (সূরা তা-হা ৫২)

ঈশ্বর ঈশ্বরসূলভ কাজই করেন

তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা আছেঃ ঈশ্বর সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হলো– 'ঈশ্বরের ক্ষমতা সবকিছুর উপর বিরাজমান।' পবিত্র কুরআন বলে– إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"For verily Allah has power over all things."

অর্থাৎ "আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(আল-কুরআন-২ ঃ ১০৬, ২ঃ ১০৯ঃ ২৮৪, ৩ঃ ২৯, ১৬ঃ ৭৭, ৩৫ ঃ ১)

কুরআন মাজীদ আরো বলে- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ.

"Allah is the deer of all he intends."

অর্থাৎ "তিনি যা চান তা-ই করেন।" (সুরা বুরূজঃ ১৬)

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে সাম ঞ্জস্যশীল কাজেরই ইচ্ছা করেন এবং তা সম্পাদন করেন। অন্যায় এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর বিপরীত কাজ তিনি করেন না।

অনেক ধর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন পর্যায়ে অবতারবাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ ঈশ্বর মানব আকৃতি ধারণ করে। তাদের যুক্তি হলো-

সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর' অত্যন্ত পবিত্র, সত্য, পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ। তাই তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সীমাবদ্ধতা ও অনুভূতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অতএব মানুষের জন্য নীতি-নিয়ম প্রণয়নের লক্ষ্যে পৃথিবীতে মানবরূপে আভির্ভূত হন। যুগে যুগে এই প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। চলুন এ যুক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করে দেখি।

সৃষ্টিকর্তা দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত বিধিমামালা প্রণয়ন করেন

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এই বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছি। টেপরেকর্ডার এমনই একটি যন্ত্র কারকানায় বহুল পরিমাণে তৈরি হয়। কিন্তু এটা কী কখনো যে, টেপরেকর্ডা ভাল কী মন্দ, তা জানার জন্য প্রস্তুতকারককে টেপরেকর্ডারের রূপ ধারণ করতে হবে? বরং এটাই স্বাভাবিক যে, প্রস্তুতকারক তার এ যন্ত্রের উৎপাদন ও চালানোর নিয়ম-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিমালা সম্বলিত একটি পুস্তক (manual) তৈরি করবেন। যার মাধ্যমে এ যন্ত্রের ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়মবালী পেতে পারে। এ পুস্তকের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া থাকবে যে, এ যন্ত্র কিভাবে ব্যবহার করা যাবে।

আপনি যদি মানুষকে তেমনি একটি যন্ত্র ধরে নেন, তবে এটা নিশ্চিত যে, মানুষ আল্লাহ তায়ালার এক জটিল ও সুনিপুণ সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই দুনিয়াতে এসে মানুষের জন্য কী ভাল আর কী মন্দ তা জানার। তিনি মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা সম্বলিত গ্রন্থ (Instruction manual) দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন-ই মানব জাতির জন্য সেই গ্রন্থ। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচার দিবসে তাঁর এ সুনিপুণ সৃষ্টির কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং এটা অত্যান্ত স্বাভাবিক যে, তিনি যে বিষয়ে হিসাব নেবেন, সে বিষয়ে পূর্ণ নির্দেশিকা আগেই পাঠিয়ে দেবেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ন করে দুনিয়ার জীবনে মানুষের কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দূত তথা রাসূল মনোনীত করেন

মানব জাতিকে তাঁর বিধি-বিধান জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার স্বয়ং দুনিয়াতে আসার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠির মধ্য থেকে বাছাই করা শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাধ্যমে তাঁর ঐশী বানী বা বিধি-বিধান দুনিয়াতে মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন। এসব বাছাই করা মানুষদেরকে বার্তাবাহক বা নবী-রাসূল বলা হয়।

কিছু লোক 'অন্ধ' ও 'বধির'

অবতারবাদী দর্শনের অসম্ভাব্যতা ও অযৌক্তিতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অনেক ধর্মের অনুসারীরা নিজেরাও এতে বিশ্বাস করে এবং অন্যদেরকেও এটা শিক্ষা দেয়। এটা কী মানুষের বুদ্ধিমত্তা (Inteligence) এবং যিনি তাকে এ বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন সেই স্রষ্টার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন নয়? এ সমস্ত লোকই প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ' ও 'বধির', যদিও আল্লাহ তাদেরকে শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ .

"Deaf, dumb and blind, they will not return (to the path).

অর্থাৎ "তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা ফিরে আসে না।" (সূরা বাকারাঃ ১৮)

বাইবেল মথির লিখিত সুসমাচারে একই কথা বলেছে–

"Seeing they see not and hearing they hear not, neither do they understand."

অর্থাৎ "তারা দেখেও দেখে না এবং শুনেও শোনে না, তারা বুঝতেও সক্ষম নয়।" (মথি ১৩ঃ ১৩)

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'ঋগবেদে'ও একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে–

"There may be someone who sees the words and yet indeed do not see them. may be another one who hears those words but indeed does not hear them."

অর্থাৎ, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বাণীসমূহ দেখে,বস্তুত তারা দেখে না; এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এ বাণীসমূহ শোনে, কিন্তু বস্তুত তারা শোনে না।" (ঋগবেদ ১০ঃ ৭১ঃ ৪)

এসব পবিত্র গ্রন্থের বাণী তাদের পাঠকদেরকে বলে যে, যদিও ঈশ্বরের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তবুও এরা সত্য থেকে বিচ্যুত-ই হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের গুণাবলী

আল্লাহর জন্যই রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর গুণবাচক নামসমূহ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى .

"Say, call upon Allah, or call upon Rahman; By whatever name you call Upon Him, (it is well) : For to Him belong the Most Beautiful Name."

অর্থাৎ "বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' কিংবা 'রহমান' বলে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম।" (বনী ইস্রাঈলঃ ১১০) একই রকম কথা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরাগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। [সূরা আ'রাফ (৭ঃ১৮); সূরা ত্বা-হা (২০ঃ৮) এবং আল-হাশ্র (৫৯ ঃ ২৩-৪)]আল-কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯টি বিভিন্ন গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো 'আল্লাহ'। কুরআন 'আল্লাহ'র পরিচয় প্রকাশে অনেক নামের মধ্যে 'আর-রাহমান' (সবচেয়ে দয়ালু), 'আর-রাহীম' (সবিশেষ দয়াবান), এবং 'আল-হাকীম' প্রভৃতি নাম উল্লেখ করেছে। আপনি যে কোন নামেই আল্লাহকে ডাকতে পারেন; কিন্তু সেই নামগুলো অবশ্যই হতে হবে সুন্দর। তবে সেই নামগুলোর উচ্চারণের সাথে সাথে মানসপটে কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন চিত্র যেন ফুটে না উঠে।

আল্লাহর সবগুলো গুণবাচক নামই সুন্দর এবং এসব গুণের মালিক একমাত্র নিজেইঃ আল্লাহ তায়ালা এসব সুন্দর নামসমূহের অধিকারীই শুধু নয়, প্রত্যেকটি নামের মাধ্যমেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ বিষয়টি বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন নভোচারী নেইল আর্মষ্ট্রং। কেউ যদি বলে যে, 'নেইল আর্মষ্ট্রং একজন আমেরিকান'। উক্তিটি সঠিক; কিন্তু তার পরিচয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। 'নেইল আর্মষ্ট্রং একজন নভোচারী'- এ পরিচয়টিও তার জন্য পূর্নাঙ্গ পরিচয় নয়, কেননা এ পরিচয় অন্যদেরও রয়েছে। যদি বলা হয় যে, 'নেইল আর্মষ্ট্রং' প্রথম ব্যক্তি যিনি চাঁদে পা রেখেছেন'। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, চাঁদে প্রথম পদার্পণ করেছেন কে? উত্তরে শুধুমাত্র বলা হবে 'নেইল আর্মষ্ট্রং'। এ কৃতিত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণাবলীও হতে হবে অনন্য ও অতুলনীয়। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আমি যদি তাঁকে বলি– 'তিনি ইমারতের নির্মাণকারী' তাহলে এটি তাঁর পরিচয় হিসেবে অনন্য নয়, কেননা অনেক মানুষ ইমারতের নির্মাতা হতে পারে। অতএব 'নির্মাতা' গুণ দ্বারা ইশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে না। আল্লাহর গুণসমূহ এমন হবে যদ্বারা শুধুমাত্র তাঁকেই নির্দেশ করবে অন্য কাউকে নয়।

উদাহরণ স্বরূপঃ

Ar-Raheem (সবিশেষ দয়াবান)

Ar-Rahman (সবচেয়ে দয়ালু)

Al-Hakeem (প্রজ্ঞাময়)

সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে- Ar-Raheem বা সবিশেষ দয়াবান কে? এর উত্তর একটিই– 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ'।

ইশ্বর-এর একটি গুণ অন্য গুণের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে নাঃ আগের উদাহরণটিকে ধরা যাক কেউ যদি বলে– "নেইল আর্মষ্ট্রং একজন আমেরিকান নভোচারী যিনি মাত্র চার ফুট লম্বা' তবে প্রথম পরিচয় (আমেরিকান নভোচারী) যথার্থ, কিন্তু সহায়ক গুণটি (চার ফুট লম্বা) মিথ্যা। একইভাবে কেউ যদি বলে যে, ঈশ্বর বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর একটি মাথা, দু'টো হাত, দু'টো পা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য তথা 'বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা' বৈশিষ্ট্যটি যথার্থ; কিন্তু সহায়ক বৈশিষ্ট্য (মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া) ভুল এবং মিথ্যা।

ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য এক-অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই নির্দেশ করেঃ যেহেতু ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাই তাঁর সব গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা একমাত্র তাকেই নির্দেশ করাটাই স্বাভাবিক। যদি বলা হয়- 'নেইল আর্মষ্ট্রং ছিলেন একজন নভোচারী যিনি চাঁদের বুকে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন; কিন্তু পরে দ্বিতীয় জন এডউইন অলড্রিন- একথাটা সঠিক নয়। কেননা প্রথম পদার্পণকারী একজনই হতে পারে। প্রথম পদার্পণকারীর দ্বিতীয় হতে পারে না। সুতরাং স্রষ্টা একক ঈশ্বর এবং প্রতিপালক অন্য ঈশ্বর-এ বক্তব্য অবাস্তব; কেননা বিশ্বজগতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। যাবতীয় মহৎ গুণাবলী স্রষ্টার একক সত্তায় পূর্ণতা প্রাপ্ত।

ঈশ্বরের এককত্বঃ বহু ঈশ্বরবাদীরা একথা বলে যুক্তি পেশ করে যে, বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক নয়। তাদের এ কথার বিরুদ্ধে যুক্তি হচ্ছে যে, বিশ্ব-জগতের যদি একাধিক ঈশ্বর থাকতো, তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই

মতপার্থক্য দেখাদিত। প্রত্যেক ঈশ্বরই অন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে চাইতো। এরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বহু ইশ্বরবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় উপাখ্যানগুলোতে। যদি এক ঈশ্বর অন্য ঈশ্বরের নিকট পরাজিত হন এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম নাহন, তাহলে পরাজিত কখনো 'ঈশ্বর' হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। ফলে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরও হতে পারেন না। বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলোতে বহু ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয়, ও প্রচলিত, কেননা সেখানে বিভিন্ন ঈশ্বরের বিভিন্ন দায়িত্ব। যেমন– সূর্যদেবতা, বৃষ্টির দেবতা ইত্যাদি। তাদের মতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন ঈশ্বর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। উপরোক্ত বর্ণনা একথার ইঙ্গিত দেয় যে, এসব ঈশ্বরের কেউ-ই সুনির্দিষ্ট কোন কাজের এককভাবে যোগ্য নয়। অধিকন্তু এক ঈশ্বরের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এমন একটি অজ্ঞ ও অক্ষম সত্তা কখনোই 'ঈশ্বর' হতে পারেন না। যদি ঈশ্বর একাধিক হতো, তাহলে মহাবিশ্বে অবশ্যই সংশয়, বিশৃংখলা, গোলমাল ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতো; অধিকন্তু মহাবিশ্বের সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ শান্তি এবং শৃংখলা বিরাজমান রয়েছে।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ

"If there were, is the heavens and the earth gods Besides Allah, there would have been confusion in both! But glory to Allah the Lord of the Throne: (High is He) above what they attribute to Him!"

অর্থাৎ "যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 'ইলাহ' থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো; অতএব আরশের অধিপতি আল্লাহ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যেগুলো তারা বলে থাকে।" (সূরা আম্বিয়া ২২)

একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে তারা তাদের সৃষ্ট ও আয়ত্বাধীন রাজত্ব নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যেতো। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ

"No son did Allah beget, nor is there any god along with Him (if there were Many gods), behold, each god would have lorded it over others! Glory to Allah! (He is free) From the (sort of) things they attribute to Him."

অর্থাৎ, "আল্লাহ কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন 'ইলাহ' ও নেই; (যদি অন্য ইলাহ থাকতো) তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়েপা পড়ত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করতো। আল্লাহ পবিত্র মহান (তিনি মুক্ত) তা থেকে যা তারা বলে।" (সূরা মুমিনুনঃ ৯১)

অতএব, এক ও অদ্বিতীয় সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-এর অস্তিত্ব থাকাটাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী।

কিছু ধর্ম কিছু রয়েছে যারা অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী, যেমন বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় ধর্ম। অজ্ঞেয়বাদ (agnostic)-এর মূলকথা হলো- 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোন কিছু আমাদের জানা নেই। সুতরাং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যাবে

না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না– এটা হলো অজ্ঞেয়বাদের ধারণা। তারা 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব স্বীকারও করে না আবার অস্বীকারও করে না। আবার কিছু ধর্ম আছে যেমন জৈন ধর্ম– এগুলো নাস্তিক্যবাদী ধর্ম। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস করে না।

[ইনশাআল্লাহ, 'কুরআন কী আল্লাহর বাণী'? নামে আমার লেখা বইতে আল্লাহর অস্তিত্বের সুদৃঢ় প্রমাণ দেয়া হয়েছে। সেখানে নাস্তিক্যবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদেরকে কুরআন থেকে গৃহীত যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের নিরিখে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।]

৯. মূলতঃ সব ধর্মই একেশ্বরবাদে (তাওহীদে) বিশ্বাসী

সকল প্রধান প্রধান ধর্মই মূলত এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সকল ধর্মগ্রন্থই একত্বাদের কথাই বলে অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় সত্য-ইশ্বরে বিশ্বাসের কথাই বলে।

মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছে ঃ

কালের প্রবাহে প্রায় সব ধর্মগ্রন্থই তাদের অনুসারীদের হাতে নিজেদের স্বার্থে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। সকল ধর্মের মূল্য কথা বিকৃত হয়ে একত্ববাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদে অথবা বহুঈশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۔

"Then woe to those who write the book with their own hands, and then say: 'This is from Allah! To traffic with it for a miserable price! woe to them for what their hands do write and for the gain they make thereby."

অর্থাৎ "সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে– "এটা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে', যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য পেতে পারে; কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করছে তার জন্যও আক্ষেপ তাদের জন্য।" (আল-কুরআন ২ঃ ৭৯)

১০. তাওহীদ

ইসলাম তাওহীদে বিশ্বাস করে, যার অর্থ কেবলমাত্র 'একেশ্বরবাদ' তথা কেবলমাত্র এক-অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করাই নয়। 'তাওহীদ' আক্ষরিক অর্থে সংযোগ সাধন করাকে বলা হয়। আরবী 'ওয়াহ্হাদা' ক্রিয়ার মূল শব্দ 'তাওহীদ' অর্থ একত্বের সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করা। তাওহীদ তিনটি শাখায় বিভক্ত–

(১) তাওহীদ আর-রবুবীয়্যাহ

(২) তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত

(৩) তাওহীদ আল-ইবাদাহ

১. তাওহীদ আর-রবুবীয়্যাহ (আল্লাহর প্রভুত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন) ঃ

তাওহীদের প্রথম শ্রেণী হলো তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ। মূল শব্দ 'রাব্বুন' থেকে 'রবূবীয়াহ' উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ 'প্রভু' রক্ষাকারী ও প্রতিপালনকারী। সুতরাং 'তাওহীদ আর-রবুবীয়্যাহ' অর্থ প্রভুত্বের একত্ব-কে দৃঢ়তার সাথে

মেনে নেয়া। এটা এ মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহই সকল বস্তুকে অস্তিত্বে এনেছেন। দুনিয়াতে অস্তিত্বশীল সবকিছুরই স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। বিশ্বে যা কিছু রয়েছ এবং পুরো বিশ্বজগতের তিনি একক স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং রক্ষাকারী। তবে এসব সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন মুখাপেক্ষিতা নেই বরং সৃষ্টিকর্তার প্রতি মুখাপেক্ষী।

২. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহর মূলসত্তা ও গুণাবলীর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন)ঃ তাওহীদের দ্বিতীয় শ্রেণী হলো–তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত। এর অর্থ হলো– আল্লাহর মূল নাম ও গুণবাচক নামসমূহের একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এ শ্রেণীর তাওহীদের পাঁচটি দিক রয়েছে–

(ক) আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রাসূল যেসব নামে তাঁকে ডেকেছেন সে নামেই তাঁকে ডাকতে হবে। কুরআনও হাদীসেএসব নামসমূহের যে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক দেয়া হয়েছে, তার বিপরীত বা অন্য কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) আল্লাহকে সেই নামেই ডাকতে হবে, যে নাম তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁকে কোন নব উদ্ভাবিত মূল বা গুণবাচক নামে কখনো ডাকা যাবে না। যেমন তাঁকে 'আল-গাদিব' (ক্রোধান্বিত) নামে ডাকা যাবে না, যদিও তাঁর ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। কেননা তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর এ নামে নামাঙ্কিত করেন নি।(গ) আল্লাহর গুণকে তাঁর সৃষ্টির গুণের সদৃশ মনে করা যাবে না। আমাদেরকে অবশ্য-অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির গুণকে তাঁর গুণের সদৃশ বলে মনে করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকতে হবে। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে– "স্রষ্টা তার মন্দ চিন্তার জন্য অনুশোচনা করেছেন, যেমন মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে", এটা তাওহীদের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আল্লাহ যেহেতু কখনো কোন ভুল-ভ্রান্তি করতে পারে না এবং সকল ক্রটির উর্ধে তাই তাঁর অনুশোচনার প্রশ্নই আসে না।

(ঘ) আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বলা হয়েছে– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ـ

"There is nothing whatever likes unto Him, and He is the one that hears and sees (all things).

অর্থাৎ, "কোন বস্তুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।" (সূরা শূরা ঃ ১১)

যদিও শোনা এবং দেখার ব্যাপার টা মানুষের সাথেও সংশ্লিষ্ট কিন্তু যখন তা আল্লাহর ব্যাপারে বলা হবে, তখন তার প্রকৃত রূপ কী হবে তা মানুষের জ্ঞানের আওতাধীন নয়। মানুষের শোনার, দেখার, জন্য কান চোখ ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে, এসব অঙ্গ ছাড়া তার শোনা ও দেখার ক্ষমতা নেই; কিন্তু আল্লাহর সত্তা সেসব সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র।

(ঘ) আল্লাহর কোন গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা যাবে না। আল্লাহর কোন অনুপম ও অতুলনীয় গুণকে মানুষের সাথে সংযুক্ত করা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। অর্থাৎ কোন মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাকে আদি ও অন্ত (চিরঞ্জীব) বলে বিশেষিত করা যাবেনা।

(ঙ) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোন নামে তাঁর সৃষ্টির নামকরণ করা যাবে না। আল্লাহর কোনকোন গুণবাচক নামকে অনির্দিষ্টভাবে 'আল যোগ না করে কোন মানুষের নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে; যেমন- 'রউফ'

'রাহীম'। আল্লাহ স্বয়ং কোন কোন নবীর ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এ শব্দগুলোর সাথে আলিফ-লাম যুক্ত করে আর-রউফ, আর-রাহীম' মানুষের নামে ব্যবহার করতে হলে তার আগে 'আব্দ' শব্দটি যুক্ত করে নিতে হবে। তখন তার অর্থ হবে-আবদুর রউফ (রউফের বান্দা বা দাস), আবদুর রহীম (রহীমের বান্দাহ বা দাস), অন্য কথায় আল্লাহর বান্দাহ বা আল্লাহর দাস।

৩. তাওহীদ আল-ইবাদাহ (ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহর একত্ব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা)ঃ

(ক) ইবাদতের অর্থ ও সংজ্ঞাঃ'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' এর অর্থ ইবাদত-উপাসনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর একত্ব সংরক্ষণ করতে হবে। 'ইবাদাহ' আরবী 'আব্দ' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ দাস বা চাকর। আর 'ইবাদাহ' অর্থ দাসত্ব বা উপাসনা। 'সালাত' হলো দাসত্বের একটি আনুষ্ঠানিক রূপ; কিন্তু এটাই একমাত্র রূপ নয়। মানুষের মাঝে ভুল ধারণা রয়েছে যে, আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর একমাত্র ইবাদত; কিন্তু ইসলামে ইবাদত বা উপাসনার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামে 'ইবাদত' হলো– আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা। আর এ ইবাদতও শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

(খ) তাওহীদের উপরোল্লিখিত তিনটি শাখাই যুগপৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাওহীদের প্রথমোক্ত দু'টো শাখায় বিশ্বাস করা অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি তৃতীয় শাখাকে তথা ইবাদতকে কার্যকর করা না হয়। কুরআন নবী (সা)-এর সমকালীন মুশরিক তথা পৌত্তলিকদের উদাহরণ পেশ করেছেন, যারা তাওহীদের প্রথম দু'টো শাখায় বিশ্বাসী ছিল।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ -

"Say: 'Who is it that sustains you (in life) from the sky and from the earth? Or, who is it that has power over hearing and sight? And who is it that brings out the lving from the dead and the dead from the living? And Who is it that rules and regulates all affeirs? They will soon say, "Allah'. will you not then show piety (to Him)?"

অর্থাৎ, "আপনি বলুনঃ 'কে তোমাদেরকে রিযক আসমান ও যমীন থেকে? অথবা, তিনি কে যার কর্তৃত্বের অধীন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি এবং কে জীবিতকে মৃত থেকেবের করে, আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন এবং কে যাবতীয় বিষয়দী নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে বলে দেবে– 'আল্লাহ'; তাহলে আপনি বলে দিন– 'তবুও কী তোমরা সতর্ক হবে না'?" (সূরা ইউনুসঃ ৩১)

একই উদাহরণ পুনরুক্ত হয়েছে সূরা যুখরুফ-এ-

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ -

"If thou ask them, who created them, they will certainly say, Allah: hou then are they deluded away (from the truth).

অর্থাৎ, "আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবেঃ 'আল্লাহ', তবুও তারা উল্টো কোন্ দিকে চলছে?" (সূরা যুখরুফঃ ৮৭)

মক্কার বিধর্মীরা জানতো যে, আল্লাহ-ই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, জীবিকাদাতা ও মালিক। তবুও তারা মুসলিম ছিল না, কেননা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য দেব-দেবীর পূজা করতো। আল্লাহ তাদেরকে 'কুফ্ফার' তথা অবিশ্বাসীদের এবং 'মুশরিকীন' তথা আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের তালিকাভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ বলেন- وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ .

"And most of them believe not in Allah without association (others as partners) with Him!"

অর্থাৎ "তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করে।" (সূরা ইউসুফঃ ১০৬)

অতএব 'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' তথা ইবাদতের ব্যাপারে এক আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণ করা তাওহীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি একাই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী এবং তিনিই মানুষকে ইবাদতের কল্যাণকর প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

১১. শিরক (অংশীবাদ)

(ক) সংজ্ঞাঃ তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক, তাওহীদের উপরোল্লিখিত কোন বিষয় বাদ পড়া অথবা সেগুলোর কোন নীতির পরিপূর্ণতার ত্রুটি করাকে 'শিরক' বলা হয়। আক্ষরিক অর্থে 'শিরক' হলো অংশীদার সাব্যস্ত করা। ইসলামী পরিভাষায় শিরকহল আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা এবং এটা প্রতিমাপূজার সমতুল্য।

(খ) শিরক সর্ববৃহৎ পাপ, যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন নাঃ

কুরআন মাজীদে সূরা নিসায় সবেচেয়ে বড় পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا .

"Allah forgives not that partners should be set up with Him; but He forgives anything else, to whom He pleases; to set up partners with allah is to devise a sin most heinous indeed."

অর্থাৎ "আল্লাহ কখনো তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধক্ষমা করেন না; তবে তিনি এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা করেনক্ষমা করেন ; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, সে মহাপাপে লিপ্ত হয়।" (সূরা নিসাঃ ৪৮)

সূরা নিসায় একই কথা পুনরুক্ত হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا -

"Allah forgives not (the sin of) joining other gods with Him, but He forgives whom He pleases other sins that this: one, who joins other gods with Allah, has strayed for away (from the right)."

অর্থাৎ, "আল্লাহ কখনো তাঁর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করেন না; আর তিনি এ ছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয় (সঠিক পথ থেকে)।" (সূরা নিসাঃ ১১৬)

(গ) শিরক জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়ঃ কুরআন মাজীদে সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে –

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ -

"The do blaspheme who say: 'Allah is christ the son of Mary'. But said Christ: 'O children of Israeel! worship Allah, my Lord and your Lord.' Whoever joins other gods with Allah—Allah will forbid him the Garden, and the Fire will he his abode. There will for the wrongdoers be no one to help."

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে তারা কাফির, যারা বলেঃ 'মসীহ ইবনে মারইয়াম-ই আল্লাহ', অথচ মসহি বলেছিল– 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর,ইবাদত করো যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২)

(ঘ) ইবাদত ও আনুগত্য করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ঃ

কুরআন মাজীদের সূরা আলে ইমরানে উল্লিখিত হয়েছে–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

"Say: O people of the Book! Come to common terms as between us and you: that we worship none but Allah; that we associate no partners with Him; that we erect not, From among ourselves, Lords and patrons other than Allah."

"If then they trun back, Say ye: 'Bear witness that we (at least) are Muslims' (Bowing to Allah's will)."

অর্থাৎ, "আপনি বলে দিনঃ 'হে আহলি কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এবং ও অভিন্ন, তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুতেই যেন তার শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহকে ত্যাগ করে; কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম।" (সূরা আলে-ইমরানঃ ৬৪)

১২. উপসংহার

কুরআন মাজীদে আছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۔

"Revile not ye those whom they call upon besides Allah, lest they out of spite revile Allah in their ignorance."

অর্থাৎ "আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তাহলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।" (সূরা আনআমঃ ১০৮)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

"And if all the trees on earth were pens and the ocean, with seven oceans behind it to add to its (suppley), yet would not words of Allah be exhausted (in the writing): for Allah is Exalted in Power, full of wisdom."

অর্থাৎ "আর পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং যত সমুদ্র আছে, তার সাথে যদি আরও সাতটি সমুদ্র শামিল হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা লুকমানঃ ২৭)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۔

"O men! Here is a parable set forth! Listen to it! Those on whom besides Allah, you call cannot creat (even) a fly, if they all met together for the purpose! And if the fly should snach away anything from them, they would have no power to release it from the fly. Feeble are those who petitioin!".

অর্থাৎ "হে মানুষ! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হলো– মনোযোগের সাথে তা শুনঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপসনা কর, তারাতো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হয়; আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা মাছির কাছ থেকে তা-ও উদ্ধার করতে পারবে না, উপসনাকরীর ও উপাসক উভয়ই কত অক্ষম।" (সূরা হাজ্জঃ ৭৩)

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি প্রভু, স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিশ্বজগতের সংরক্ষক।